৮ ☐ ভারতে মহিলা এবং রাজনীতি

"One is not born a woman,
One becomes a woman."

—Simone De Beauvoir

ভারতীয় মহিলারা আজকাল রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা পোষণ করছে এবং রাজনীতি থেকে তারা নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখছে। রাজনীতিও মহিলাদের নিজেদের সীমানার বাইরে রাখতে চাইছে। মনে হয় বিষয়টি যেন পুরুষদের জন্য পুরুষদের দ্বারা এবং শুধুমাত্রই পুরুষ পরিচালিত। রাজনীতি মহিলাদের জন্য নয় কারণ মনে করা হয় এটা প্রকৃতিগতভাবে পুরুষতান্ত্রিক। রাজনীতির মাধ্যমে মহিলাদের পুরুষের অধীনস্থ করে রাখা হয়। রাজনীতি এমন সব বিষয় নিয়ে কাজকর্ম করে যেমন, যুদ্ধ, ক্ষমতা, দ্বন্দ্ব, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি বিষয়গুলো সাধারণভাবে মনে করা হয় মহিলাদের এক্তিয়ারের বাইরে। মহিলারাও মনে করে যে যদি তারা সক্রিয়ভাবে রাজনীতিতে আগ্রহ দেখায় তাহলে তাদের 'মেয়েলী' স্বভাব ক্ষুণ্ণ হবে। সাধারণ কাজ যেমন সরকারি ক্ষমতা, আইন পরিচালনা কিংবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ এসবই পুরুষদের কাজ বলে মনে করা হয়। অন্যদিকে গার্হস্থ বিপুল পরিমাণ কাজকে একান্তই ব্যক্তিগত মহিলাদের কাজ বলে গণ্য করা হয়। রাজনীতিতে মহিলাদের পিছিয়ে পড়ার একাধিক কারণ আছে। যে বিষয়ে অনুসন্ধান করবার আগে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় ভারতীয় মহিলাদের অবস্থান কেমন ছিল সেটা প্রথমে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

গত শতাব্দীর প্রথম তিন দশকে জাতীয় আন্দোলনে মহিলাদের রাজনৈতিক ভূমিকার পরিচয় পাওয়া যায়। অষ্টাদশ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলনের মধ্য দিয়েই মহিলারা প্রথম শিক্ষার সুযোগ পায়। এছাড়া মহিলাদের বিরুদ্ধে প্রচলিত সামাজিক বঞ্চনা ও নিপীড়নের বিরুদ্ধেও আন্দোলনকারীরা উদ্যোগী হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এই আন্দোলনের পিছনে পুরুষদের সমর্থন ছিল এবং মূলত এলিট মহিলারাই এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এই শ্রেণীর মহিলারা কখনোই ঐতিহ্যবাহী পুরুষতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করত না। বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় মহিলাদের স্বাধীন পরিচয়ের জন্য বাংলায় সরলাদেবী চৌধুরী (১৯১০) এবং সরোজ নলিনী দত্ত (১৯১৩) প্রথম মহিলা সমিতি গড়ে তোলেন। মহিলাদের অন্য আরও সংগঠন যেমন, Women's Indian Association (1917) এবং All India Women's Conference (AIWC, 1927) মাদ্রাজে গড়ে ওঠে। গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলনে বিরাট সংখ্যক মহিলাকে রাজনীতিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। গান্ধীর নেতৃত্বে ১৯২০-র দশক থেকে বিভিন্ন গণআন্দোলন যেমন অসহযোগ (১৯২১) এবং আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩১) ও পরবর্তী ভারত ছাড় (১৯৪২) আন্দোলনে ব্যাপকভাবে সাধারণ মহিলারা অংশগ্রহণ করে। বস্তুতপক্ষে গান্ধীর নির্দেশিত খাদি আন্দোলন মহিলাদের অর্থনৈতিকভাবে সাবলম্বী হতে সাহায্য করে। গান্ধীর আহ্বানে আপামর মহিলারা অর্থাৎ ধনী, দরিদ্র, গ্রামীণ, শহুরে সর্বস্তরের মহিলারা জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। তারা একদিকে বিদেশী দ্রব্য বর্জন করেছে, খাদি পরেছে, লবণ বানিয়েছে, মাদক বিক্রির বিরুদ্ধে পিকেটিং করেছে, অন্যদিকে লাঠি বা বুলেটের আঘাত সহ্য করতে পিছুপা হয়নি এবং প্রয়োজনে গ্রেপ্তারী বরণ করেছে। এইসব মহিলাদের মধ্যে কেউ কেউ আবার চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন। মহিলারা বাংলার তেভাগা আন্দোলনের সময় (১৯৪৬-১৯৫০) এবং অন্ধ্রপ্রদেশে তেলেঙ্গানা আন্দোলনের (১৯৪৮-১৯৫১) সময় গ্রাম রক্ষা করার জন্য "মহিলা ব্রিগেড" ("Women's brigades") গঠন করেছিল। কাজেই মহিলারা নিজেদের সংগঠিত করে এবং জাতীয় আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে ভারতের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় এক বিশেষ প্রভাব সৃষ্টি করে। সমালোচকরা বলেন যে আসলে বিদেশী ঔপনিবেশিক শাসকদের হাত থেকে ক্ষমতা আদায় করবার জন্যই পুরুষরা নারীদের এগিয়ে দেয়। কারণ

Scanned with CamScanner

ইংরেজরা সবসময়ই দেশীয় পুরুষদের অত্যন্ত কাপুরুষ এবং ভীত স্বভাবের বলে মনে করত। কাজেই বিরাট সংখ্যক মহিলাকে জাতীয় আন্দোলনের সামনে এনে দেশপ্রেমিক পুরুষেরা একদিকে ইংরেজদের সামনে একটা বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিতে পারে এবং অন্যদিকে নিজেদের পৌরষত্ব রক্ষা করতে পারে।

স্বাধীনতার পর কিন্তু রাজনীতিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ দ্রুত হারে কমতে থাকে। ১৯৫২ সালে সংসদে ১৪ জন মহিলা কংগ্রেস প্রতিনিধি ছিলেন এবং সামগ্রিকভাবে লোকসভায় মহিলা প্রতিনিধির হার ছিল ৪.৪ শতাংশ। অর্থাৎ ভারতের প্রথম লোকসভায় ৪৯৯ জন প্রতিনিধির মধ্যে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল মাত্র ২২ জন। ১৯৯৮ সালে এই প্রতিনিধির সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় মাত্র ৪৪-এ। মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা সবচেয়ে কম ছিল ১৯৭৭ সালে। সেসময় মহিলা MP ছিলেন মাত্র ১৯ জন অর্থাৎ ৩.৪ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি মহিলা MP দেখা যায় অষ্টম (১৯৮৪) এবং দ্বাদশ লোকসভায় (১৯৯৮)। এই সময় মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ছিল ৪৪ জন অর্থাৎ ৮.৯ শতাংশ। বস্তুতপক্ষে ১৯৮৪ সালের পর থেকেই মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা কমতে শুরু করে। রাজ্যসভাতেও মহিলা প্রতিনিধির হার কোন অংশেই ভালো নয়। সেখানে সর্বমোট ২৫০ জন সদস্যের মধ্যে মহিলা প্রতিনিধির সংখ্যা ১৪ থেকে ২৯ অর্থাৎ ৫.৮ থেকে ১১.৮ শতাংশের মধ্যে সাধারণত ঘোরাফেরা করে। সাধারণভাবে লক্ষ্য করা গিয়েছে যে রাজনৈতিক দলগুলোও মহিলাদের সংসদে প্রার্থী করতে বিশেষ আগ্রহী নয়। কাজেই মহিলাদের সাম্য এবং ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াটি রাজনৈতিক দলীয় সংগঠন থেকেই শুরু করা প্রয়োজন। দুঃখের বিষয়ে কংগ্রেস দলের সর্বোচ্চ সাংগঠনিক স্তরে অর্থাৎ কংগ্রেস কার্যনির্বাহী কমিটিতে গড়ে দুজন মহিলা প্রতিনিধি সদস্য এবং CPI(M)-র পলিটব্যুরোতে একজনও মহিলা সদস্য নেই। অন্য দলগুলোর সাংগঠনিক স্তরেও মহিলা সদস্যের সংখ্যা এইরকমই বা এর থেকেও কম।

মহিলাদের অবস্থান বিষয়ে একটি উল্লেখযোগ্য রিপোর্ট "Towards Equality" (December, 1974)তে উল্লেখ করা হয় যে ভারতের রাজনীতি মহিলাদের ক্ষমতার স্বার্থক রূপায়ণে একেবারেই ব্যর্থ। যদিও সংখ্যায় মহিলারা সমাজের অর্ধেক অংশ কিন্তু রাজনৈতিক ক্ষমতার ক্ষেত্রে তাদের নিম্নমুখী অবস্থায় ক্রমশই তাদের সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্রেণীতে রূপান্তরিত করছে। যদি এই প্রবণতা অব্যাহত থাকে তাহলে তারা একেবারেই রাজনৈতিক ব্যবস্থা থেকে হারিয়ে নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে। তাদের অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে কমিটি কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ সুপারিশ করেছে। সেগুলি হল : (ক) রাজনৈতিক দলগুলো অবশ্যই মহিলা প্রার্থীদের জন্য কোটা নির্ধারণ করবে। (খ) পুরসভাগুলোতে মহিলাদের জন্য বেশকিছু আসন নির্ধারণ করতে হবে। (গ) সাময়িক পদক্ষেপ হিসেবে মহিলা পঞ্চায়েত গঠন করতে হবে। কিন্তু অন্য সংগঠনও দাবী করতে পারে এই আশঙ্কায় কমিটি মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে। পরবর্তীকালে ৭৩-তম এবং ৭৪-তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত এবং পুর স্তরে মহিলাদের জন্য এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। ১৯৯৩ সালে পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েত নির্বাচনে ২৪,৮৯৫ টি আসন অর্থাৎ ৩৫ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল। অবশ্য এর মধ্যে তপশিলী জাতি/উপজাতি ভুক্ত মহিলারাও অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরবর্তীকালে ১৯৯৬ সালে লোকসভা এবং রাজ্য বিধানসভাগুলোতে এক-তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণের জন্য ৮১ তম সংবিধান সংশোধনী বিল লোকসভায় উত্থাপন করা হয়। কিন্তু আজ পর্যন্ত সেই বিল সম্ভবত পুরুষ সাংসদদের তীব্র বিরোধিতায় অনুমোদিত হয়নি। রাজনীতিতে মহিলাদের ক্রম নিম্নমুখী অংশগ্রহণের এটা একটা অন্যতম কারণ। অন্য কারণগুলো হল : প্রথমত, ভারত ভাগ থেকে সাম্প্রতিক ২০০২ সালের গুজরাত সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির যে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটেছে এবং এই প্রেক্ষিতে রাষ্ট্রের যে ভূমিকা তা অবশ্যই বিস্ময়কর। বলা যেতে পারে পুরুষশাসিত রাষ্ট্র যেন মহিলাদের রক্ষা করার পরিবর্তে নিপীড়ন করবারই যন্ত্র। প্রতি সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে লক্ষ্য করা যায় যে যুদ্ধরত সম্প্রদায়ের মহিলারা পুরুষদের আক্রমণের শিকার হন এবং প্রশাসন এক্ষেত্রে সচেতনভাবে নিষ্ক্রিয় থাকে। অনেক সময়ই রাষ্ট্রই হিংসার বাহক হিসেবে কাজ করে। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় সবসময়ই মহিলারা সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায়ের আক্রমণের লক্ষ্য হয়, তারা যথেচ্ছভাবে নিপীড়িত,

Scanned with CamScanner

ধর্ষিত এবং লাঞ্ছিত হয়। ২০০২ সালে গুজরাট দাঙ্গায় বিস্মিত হয়ে হর্ষ ম্যানভার মন্তব্য করেন যে, মহিলাদের নির্লজ্জভাবে যেভাবে গুজরাট দাঙ্গায় হিংসার বলি হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে তিনি এর আগে কখনও কোন সংঘর্ষে এরকম দেখেননি। রিপোর্ট অনুযায়ী দেখা গিয়েছে যে সেখানে যুবতী মেয়ে ও মহিলাদের পরিবারের সদস্যদের সামনে গণধর্ষণ করে এবং তারপর জীবন্ত পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছে। এই ধরনের রাজনৈতিক সংঘর্ষ ভারতীয় মহিলাদের মনে রাজনীতির প্রতি বিতৃষ্ণা জাগায়। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় এই ধরনের ঘটনা ভারত বিভাগের সময় থেকে চলে আসছে। সাম্প্রদায়িক গুণ্ডারা সেই সময় হাজার হাজার মহিলাকে ধর্ষণ করেছে, লক্ষ লক্ষ মহিলাকে সহায়সম্বলহীন ভাবে উভয় সীমানার যে-কোন প্রান্তে ছেড়ে রেখে পালিয়েছে। অবিবাহিত মা, ধর্ষণের শিকার এমন সব লাঞ্ছিত মহিলাদের সেই সময় পতিতা বৃত্তি অবলম্বন ছাড়া নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার আর কোন পথই খোলা ছিল না।

দ্বিতীয়ত, সংসদ এবং রাজ্য আইনসভা নির্বাচনের সময় বর্তমান ভারতীয় গণতন্ত্রে যে ব্যাপক হিংসা এবং পেশি শক্তির আস্ফালন দেখতে পাওয়া যায় তাতে মহিলারা রাজনীতিতে আরও অসহায় বোধ করে। মহিলারা যেহেতু শারীরিক ভাবে দুর্বল সেই কারণে পুরুষশাসিত এবং পুরুষকেন্দ্রিক হিংসার রাজনীতিতে মহিলারা ক্রমশই বিতৃষ্ণা হয়ে উঠছেন। রজনী কোঠারী এই প্রসঙ্গে মন্তব্য করেন যে সার্বিক এই বিতৃষ্ণার কারণেই রাজনীতিতে ক্রমশই অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

তৃতীয়ত, সমস্ত রাজনৈতিক দলেই পুরুষতান্ত্রিক প্রাধান্যের জন্য মহিলারা ক্রমশই তাদের ব্যক্তিগত বিষয়েই নিজেদের সীমিত রাখে। যদিও স্বাধীনতার পরে মহিলাদের স্বার্থ সম্বন্ধীয় কতকগুলো আইন অনুমোদিত হয়েছে। শতবর্ষের জন্মদিন উপলক্ষ করে ড. কার্ভকে (ভারতে মহিলা শিক্ষার পুরোধা) উদ্দেশ্য করে ১৯৫৮ সালে নেহরু বলেন :

'I say it by way of emphasizing the importance of the mothers and daughters and sisters of a nation. One of the truest mesures of a nation's advancement is the state of its women. For out of the women comes the new generation and it is from their lips and from their laps that it begins to learn', অর্থাৎ তিনি জাতি গঠনে মা, কন্যা এবং ভগ্নীর গুরুত্বের কথা স্মরণ করেন। মহিলাদের সামাজিক অবস্থানের উপরই একটি জাতির উন্নয়ন নির্ধারিত হয়। কারণ একটি নতুন প্রজন্মের জন্ম হয় মহিলাদের গর্ভ থেকেই এবং তাদের কোলে মানুষ হয়েই ও তাদের বুলি থেকেই শিশু জীবনের প্রথম শিক্ষা পায়।

এটা আশা করা হয় যেন রাষ্ট্রের জন্য মানবসম্পদের জন্ম দেওয়াই মহিলাদের একমাত্র কাজ। হিন্দু কোড বিল অনুমোদন করে নেহরু মহিলাদের সম্পত্তি এবং বিবাহের ক্ষেত্রে সাম্য আনতে চেয়েছিলেন। বিজেপি, আর.এস.এস. এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদ রক্ষণশীল পিতৃতান্ত্রিক হিন্দু ধারা অনুযায়ী সমাজে এবং রাজনীতিতে 'মাতৃশক্তি'র উপর গুরুত্ব আরোপ করে। সমাজে স্ত্রী এবং 'মা' হিসেবে হিন্দু মহিলাদের গুরুত্বের কথা সমাজে তারা তুলে ধরেন। এর মাধ্যমে তারা পরিবার ও হিন্দু ঐতিহ্য সংরক্ষণের দাবী জানায়। কাজেই এদের দৃষ্টিভঙ্গীতে যেসব মহিলারা পুরুষের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাজনীতিতে লড়াই করছে কিংবা বৈষম্যমূলক আইনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হচ্ছেন তারা বিশেষ সম্মানীয় নন। মুসলিম মহিলাদের স্ত্রীভাতা সংরক্ষণের জন্য 'সা বানু' মামলায় সুপ্রিম কোর্ট রায় দেয়। মহিলাদের এই অধিকারের বিরুদ্ধে মৌলবাদী মুসলিম সম্প্রদায় সোচ্চার হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত সরকার ধর্মনিরপেক্ষতা উপেক্ষা করে মৌলবাদীদের সমর্থনে আইন পাস করে। 'সা বানু' মামলায় মুসলিম মৌলবাদীদের সন্তুষ্ট রাখবার জন্যই কংগ্রেস ক্রিমিনাল পেনাল কোডের ১২৫-তম অনুচ্ছেদ সংশোধন করে। ১৯৮৬ সালে মুসলিম মহিলারা পরিষ্কারভাবে ক্রিমিনাল পেনাল কোড অনুযায়ী তাদের সীমিত ভরণপোষণের বিরুদ্ধে দাবী জানায় এবং তার থেকে মুক্তির আবেদন জানায়। এই পরিপ্রেক্ষিতে লক্ষ্মী লিঙ্গাম উল্লেখ করেন যে, সমাজ এবং রাষ্ট্রের এই

Scanned with CamScanner

বৈষম্যের বিরুদ্ধে মহিলা কর্মীরা আরও বড় ধরনের আন্দোলনের কথা অনুভব করেন। কিন্তু মৌলবাদীদের কারণেই সাম্প্রতিককালে মহিলা আন্দোলনের কর্মসূচিতে এইসব বিষয়গুলো বিশেষ আলোকপ্রাপ্ত হয় না। এবং তারই পরিণামে মহিলাদের উপর নৃশংস অত্যাচার, গুজরাত কাণ্ড এবং রাজস্থানে উগ্র হিন্দুদের সৌজন্যে স্বামীর চিতার রূপ কানোয়ারের জীবন্ত দগ্ধ হবার মতো পৈশাচিক ঘটনা এখনও এদেশে ঘটে।

বর্তমানের নতুন আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে গতানুগতিক গণতান্ত্রিক আন্দোলন বা শ্রেণীর নিরিখে না দেখে মহিলাদের সমস্যাগুলো স্বতন্ত্রভাবে পর্যালোচনা করবার দাবী উঠছে।

আজকের নারীবাদীরা লিঙ্গবৈষম্য এবং বিশেষ করে মহিলাদের বিপক্ষে রাষ্ট্রের নিপীড়নের চেহারাটা তুলে ধরবার চেষ্টা করছে। তারা মনে করে রাষ্ট্রের ভেতরে এবং বাইরে মহিলাদের নিয়ে নতুন করে চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। মহিলাদের আন্দোলনকে একটা সার্বিক আন্দোলনের রূপ দেবার কথাও তার ভাবছেন। বড় মেট্রোপলিটন শহরে মহিলাদের নিজস্ব সংগঠন গড়ে উঠছে। ১৯৭৮ সাল থেকে দিল্লিতে মাজুসী নামে মহিলাদের একটি পত্রিকা ইংরেজি, হিন্দী এবং বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষায় প্রকাশিত হচ্ছে। মহিলাদের বিষয়ে ব্যাপক সচেতনতা তাদেরকে মহিলাদের উন্নয়নের বিষয়ে আরও সক্রিয় করে তুলছে। মহিলাদের অধিকার ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা এবং অনুমোদনের জন্য বিভিন্ন আলোচনা, সেমিনার ইত্যাদির আয়োজন করা হচ্ছে। মহিলাদের নিজস্ব কর্মধারার মধ্য দিয়েই তাদের অধিকারের একটা স্পষ্ট রূপ দেওয়া সম্ভব হয়েছে। শুধুমাত্র প্রচারের আলোর জন্যই নয় মহিলারা আজ সরকারের ক্ষমতার অলিন্দে এবং রাজনৈতিক দলের নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রেও সমানভাবে সক্রিয় হয়ে উঠবার চেষ্টা করছে।

Scanned with CamScanner